মহাকাশ বার্তা

৩৭ সংখ্যা ❑ নভেম্বর - ডিসেম্বর ১৯৯৮
[বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন -এর প্রকাশনা]

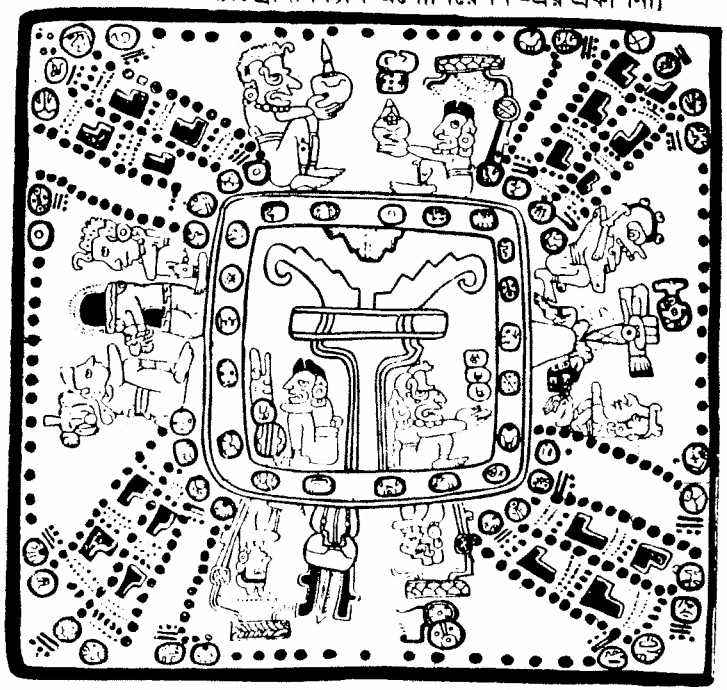

আদিম গুহাবাসী মানুষ ছিল প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংসর্গে দৈনন্দিন সূর্য ও চাঁদের উদয়-অস্ত তাদেরকে কৌতুহলী করতো।

"দিনের পর রাত হয়। এর কারণ নিশ্চয়ই সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ বোধহয় সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যায় এই তথ্যই আবিষ্কার করে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনের পরেই ঋতু পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। গরমের উত্তাপ, শীতের শৈত্য, বর্ষার বৃষ্টি, আবার কোন সময় চারদিক ফুলে ফলে ভরে ওঠা-এসব অবস্থার পুনরাবৃত্তিও মানুষ লক্ষ্য করে। মানুষ ঋতুর সঙ্গে দিনের সম্পর্ক নির্ণয়ে তৎপর হয়ে ওঠে। ঠিক কতদিন পর শস্য বোনার কাল আসবে বা শীতের আগমন ঘটবে-বাস্তবিক কারণেই তা জানা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, আর এভাবেই বছর ও দিনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যই মানুষ পঞ্জিকা প্রণয়ন করে।" সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ক্রমান্বয়ে প্রণিত বিভিন্ন পঞ্জিকার কাহিনী দিয়েই এ সংখ্যার প্রচ্ছদ রচনা **"পঞ্জিকার পূর্বকথা"**।

পঞ্জিকার পূর্বকথা - আলীফ হোসেন - ৩১

স্বর্গের দেবতা মর্ত্যের উপকথা !
রানী ক্যাসিওপিয়া - মোহাম্মদ আবদুল জব্বার - ১৯

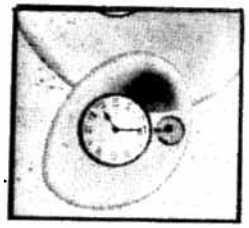

কিছুক্ষণ
আমাদের মাঝে প্রফেসর নারলিকা - ৯৭

ক্ষুদে পন্ডিতদের প্রবেশ নিষেধ !
জ্যোতির্বিজ্ঞানের মজা ঃ ৫ - মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম - ৪৯
পদার্থবিজ্ঞানের মজার ঘটনা ঃ ৬ - মারুফ বিন আলম - ৫২
পদার্থবিদ্যার প্রথম পাঠ ঃ ৪ - মুহম্মদ জাফর ইকবাল - ৫৮
গণিত কত মজার ! - মারুফ বিন আলম - ৬৫
মঙ্গলের ছোট পরিবার - দেওয়ান মাসুদ করিম - ৭
ভবঘুরে গ্রহের সন্ধানে - জুবায়ের আশরাফ - ২৫
ফার্মার শেষ উপপাদ্যের সমাপ্তি - মুহম্মদ ইব্রাহীম খান - ৬৮
মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য : স্থিতি তত্ত্ব - মিতুল আনোয়ার চৌধুরী - ৭৫
মানমন্দিরের গল্প - মিশুক আনোয়ার চৌধুরী - ৭৯
নক্ষত্রের গঠন ও বিবর্তন - প্রকৌশলী সুকল্যান বাছাড় - ৮৫
গ্যালিলিও গ্যালিলি - শ্রী সুজন কুমার দেব - ৯১
তারার ছবি ঃ ৫ - পারভেজ মনন - ৯৫
সবুজ শত্রু - জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার - ১০৩
গ্যালাক্সি গবেষকদের কথা - সৈয়দ আশরাফউদ্দিন - ১১৮
মহাকাশে খনিজ ভান্ডার - এফ, আর সরকার - ১২১
অ্যাস্ট্রোনমি সফটওয়ার - ১২৪
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ঃ মঙ্গল - সৈয়দ আশরাফউদ্দিন - ১২৮
নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু - নাজমুল আলম চৌধুরী - ১৩২
দূর পৃথিবীর ডাক - আর্থার সি. ক্লার্ক - ১৩৯
তথ্যাণু - ১৫০
জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্যালারী - ১৫৪
বই পরিচিতি - ১৫৫
সংগঠন সংবাদ - ১৫৭
ডাকঘর - ১৫৯

[আলোকচিত্র সৌজন্য ঃ JPL. NASA, SKY AND TELESCOPE, ASTRONOMY, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

FOR A MODERN TANNERY UPTO FINISH UNIT AND
COMPLETE PLANT MACHINERY & COMPONENT
OF SHOE PROJECT

PLEASE CONTACT
unidev ltd.
DCCI BUILDING (5TH FLOOR)
65-66, MOTIJHEEL C/A
DHAKA, BANGLADESH
PHONE: 9567875, 9550419 FAX: 9567876

We are specialsed in supply and services of Leather processing machines and chemicals in Bangladesh supplied innumerable machines to almost all the leading tanneries producing crust and finished leather, on behalf of world renowned tannery machine manufacturers from Europe. Besides the tannery machines we are also in the field of turnkey services for supply of Leather shoe making unit and shoe components on behalf of world's most experienced supplier from Italy.

We are proud to mention herebelow the world leaders in leather field for whom we are working as an exclusive agent in Bangladesh.

MERCIER TURNER
TANNING MACHINERY

FINVAC
VACUUM DRYER

CO.MA.R. s.r.l.
RECONDITIONED & NEW
TANNING MACHINERY

TORIELLI S.p.A
SHOE MACHINERY

For Chemicals

***CAM PAZARLAM* A.S.**
BASIC CHROMIUM SULPHATE (TANKROM)
SODIUM-BI-CHROMATE

FORESTAL QUEBRACHO LTD.
VEGETABLE TANNING EXTRACT
UNITAN ATO

মঙ্গলের ছোট পরিবার

দেওয়ান মাসুদ করিম

বহুদিন পর্যন্ত প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল–পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার চাঁদ বা উপগ্রহ রয়েছে। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও যখন প্রথমবারের মত তাঁর নিজ হাতে নির্মিত টেলিস্কোপ নিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন তখন চাঁদের পর এই সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ হিসাবে বৃহস্পতির উপগ্রহের সন্ধান পান। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আলোক তরঙ্গ তত্ত্বের আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনির উপগ্রহ আবিষ্কার করেন এবং টেলিস্কোপের ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে সৌরজগত নামক পরিবারের সদস্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮৫০ সালে সৌরজগতে মোট উপগ্রহের সংখ্যা দাড়ায় আঠারটি, বৃহস্পতির চারটি, শনির আটটি, ইউরেনাসের চারটি আর নেপচুনের একটি।

এই সময়ে সৌরজগতে গ্রহ, উপগ্রহ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের মাঝে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এত আবিষ্কার ও প্রতিযোগিতার ভিড়েও তখন পর্যন্ত আন্তঃগ্রহ বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলের কোন উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে সময়ে শুক্র গ্রহের একটি উপগ্রহ রয়েছে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় উপগ্রহটি 'দুরবীন ভূত' ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কারক উইলিয়াম হার্সেল পর্যন্ত মঙ্গলের উপগ্রহ আবিষ্কারের এক ব্যর্থ চেষ্টা চালান।

আবিষ্কারের কাহিনী

মঙ্গলের উপগ্রহ আবিষ্কারের চিন্তাটি বিজ্ঞানীদের মাথায় ঢুকে পড়ে কেপলারের এক ভবিষ্যদ্বাণী থেকে। ১৬১০ সালে কেপলার ঘোষণা দেন মঙ্গলের উপগ্রহ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার এই কল্পনার ভিত্তি ছিল মজার এক হিসাব। যেহেতু পৃথিবীর একটি ও বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ রয়েছে (তখন পর্যন্ত চারটিই জানা ছিল), আর মঙ্গল এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তাই গাণিতিক গড় হিসাবে মঙ্গলের দুটি আর শনির আটটি উপগ্রহ থাকা উচিত! আর এই হিসাবটি পুরোপুরিই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মারার মত মনে হলেও অন্তত মঙ্গলের ক্ষেত্রে তার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

তবে মঙ্গলের উপগ্রহ আবিষ্কারের চেষ্টার সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীর জন্ম দেন 'গালিভার্স ট্রাভেলস' এর লেখক জোনাথন সুইফট, কেপলারের সময়। ভবিষ্যদ্বাণীকে তিনি সত্যি বলে ধরে নেন। ইতালির ধূমকেতু আবিষ্কারের প্রায় দেড়শ' বছর আগে ১৭২৭ সালে

সুইফট তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'গালিভার্স ট্রাভেল' এ লেখেন যে, রূপকথার উড়ন্ত দ্বীপ 'লেপুটা'-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন দুটি ছোট তারা বা উপগ্রহ; যা মঙ্গলের চারদিকে ঘুরছে। উপগ্রহ দুটির একটি মূল গ্রহের ব্যাসের তিনগুণ দূরে এবং অপরটি পাঁচগুণ দূরে রয়েছে। এদের মাঝে প্রথমোক্তটি প্রতি দশ ঘন্টায় এবং দ্বিতীয়টি প্রতি সাড়ে বার ঘন্টায় একবার মূল গ্রহকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। মঙ্গল হতে উপগ্রহ দু'টির দূরত্ব নির্ণয়ে ভুল হলেও এদের ব্যাস, আবর্তনকালের হিসাব অন্তত তখনকার দিনে তেমন একটা ভুল ছিল বলে মনে হয়নি। যেহেতু সুইফট কেপলারের তৃতীয় সূত্রটি জানতেন, তাই তিনি এদের আবর্তনকাল হতে মূল গ্রহ থেকে এদের দূরত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম হন। কিন্তু সে সময়ে মঙ্গলের ভর সঠিকভাবে জানা না থাকায় তার হিসাবেও যথেষ্ট ভুল রয়ে গিয়েছিল। অনেকের মতে তার হিসাব সম্ভবতঃ উপগ্রহ দু'টি পর্যবেক্ষণের ফলেই সম্ভব হয়েছে (অথবা তিনি নিজেই একজন মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী ছিলেন)। কিন্তু আজ পর্যন্ত সুইফট-এর এই হিসাবের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৭৪৫ সালে তিনি যখন মারা যান তখন পর্যন্ত এমন কোন শক্তিশালী টেলিস্কোপ খুঁজে পাওয়া যায়নি যার সাহায্যে এদের অন্তত একটিকে দেখা সম্ভব। তাই তার বর্ণনা 'ঝড়ে বক মরা'র মতই সাধারণ অনুমান মাত্র। তবে তার এই রহস্যময় বর্ণনা আমাদের কাছে এখনও অদ্ভুত ও অসাধারণ বলে মনে হয়।

তবে ১৭৫০ সালে ভলতেয়ারও তার অদ্ভুত কাহিনী 'মাইক্রোমেগাস' (Micromegas) এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটান। তার যুক্তি ছিল আরও মজার। তিনি যুক্তি দেন যেহেতু মঙ্গল সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় আরও দূরে অবস্থিত, তাই এটি ছোট ছোট দুটি উপগ্রহের চেয়ে বেশি উপগ্রহ আটকে রাখতে পারবে না। লেখকদের এই প্রচেষ্টার কোন পর্যবেক্ষণগত ভিত্তি না থাকলেও মঙ্গলের উপগ্রহ আবিষ্কারে পরবর্তীকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এসব কাহিনীই প্রেরণার উৎসাহরূপে কাজ করেছিল।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন অবজারভেটরীর এক সময়কার পরিচালক হেনরি ডি' অ্যারেস্ট ১৮৬২ সালে দ্বিতীয়বারের মত মঙ্গলের উপগ্রহ খোঁজার চেষ্টা চালান, কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হন। তার এই ব্যর্থতার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন 'সাদাটুপিওয়ালা মঙ্গলের' কোন উপগ্রহ নেই। কিন্তু ১৮৭৭ সালটি ছিল মঙ্গলের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় বছর। বহু প্রতীক্ষার পর বিজ্ঞানী শিপারলি মঙ্গলের তথাকথিত 'খাল' আবিষ্কার করেন।' আর সেই সাথে মঙ্গলের দুটি ক্ষুদ্র উপগ্রহেরও সন্ধান পান আমেরিকার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

১৮৭৭ সালে মঙ্গল গ্রহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য চমৎকার একটি অবস্থানে ছিল। তাই বিজ্ঞানী আসফ্ হল মঙ্গলের রহস্যময় উপগ্রহের সন্ধানে আর একবার মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। এই পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি ওয়াশিংটনে ২৬ ইঞ্চি ব্যাসের বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিসরণ টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন। অগাস্ট ১০/১৮৭৭ তারিখে তিনি তার পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি পিছনের কিছু তারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু অগাস্ট ১১ তারিখ রাত ২.৩০ মিনিটে মঙ্গলের খুব কাছে তিনি একটি ক্ষীণ বস্তু দেখতে পান, যা তার কাছে কিছুটা আশাব্যাঞ্জক বলে মনে হল।

দুর্ভাগ্যবশত, ওয়াশিংটন শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পোটোমেক নদী থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করে, যার ফলে তিনি ক্ষীণ বস্তুটির উপর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে ব্যর্থ হন এবং পরবর্তী চার রাতে একই ঘটনা ঘটতে থাকে। অবশেষে অগাস্ট ১৬ তারিখে আকাশ কুয়াশামুক্ত হয়। এবার তিনি বস্তুটিকে আবার দেখতে পান এবং শিগ্‌গিরই বুঝতে পারেন খুব কাছ থেকে বস্তুটি মঙ্গলের চারদিকে ঘুরছে, যা কোন তারা নয় বরং মঙ্গলেরই কোন প্রাকৃতিক উপগ্রহ। পরদিন রাতে তিনি পর্যবেক্ষণে চমকপ্রদ ফলাফল পান। কারণ, ঐদিন তিনি আগের রাত্রে দেখা ক্ষীণ বস্তুটিকেই শুধু খুঁজে পাননি, সেইসাথে আগেরটির চেয়ে মঙ্গলের আরও কাছে আরও একটি বস্তুর সন্ধান পান।

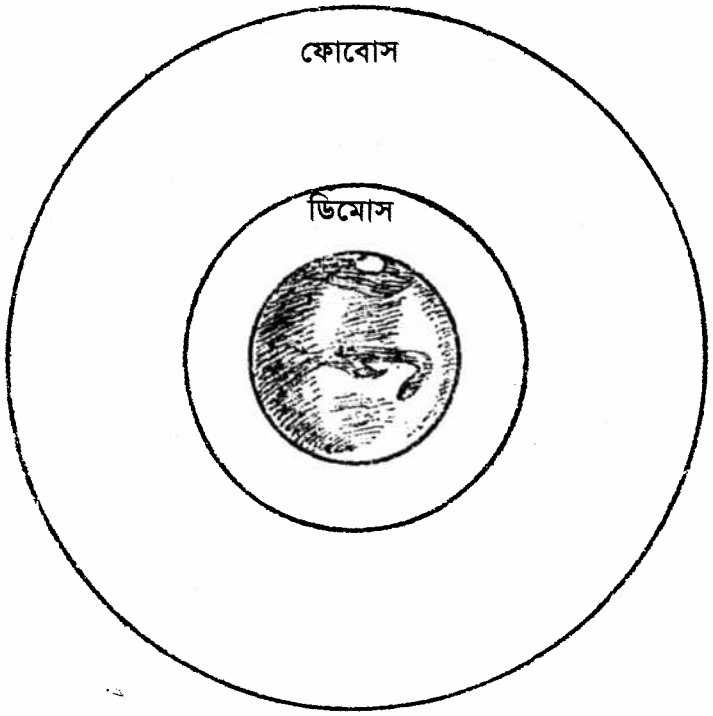

ফোবোস ও ডিমোসের কক্ষপথ (একই স্কেলে আঁকা)

প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অগাস্ট ১৮ তারিখে তিনি তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল ঘোষণা করেন। ততক্ষণে তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্ততঃপক্ষে ভিতরের দিকের বস্তুটি অদ্ভুত আকৃতির এক উপগ্রহ। হলের নিজের ভাষায় 'আমি প্রথমে মনে করেছিলাম মঙ্গলের হয়তোবা দুই বা ততোধিক উপগ্রহ রয়েছে। তবে একটি ব্যাপার আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল। সাধারণত কোন উপগ্রহের মূলগ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে যতটা সময় লাগে তা মূল গ্রহের আবর্তনকালের চেয়ে কম হয়। এই ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য আগস্ট ২০ এবং ২১ তারিখে সারারাত উপগ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করি এবং সত্যিকার অর্থে দু'টির মাঝে একটি, যা ভিতরের দিকে অবস্থিত এবং মূল গ্রহের আবর্তনকালের এক-তৃতীয়াংশ সময়ে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে, যা এই সৌরজগতে এক অনন্য উদাহরণ।'

এ ধরনের ঘটনা সৌরজগতে বিরল ও অসাধারণ। মঙ্গলের অক্ষীয় ঘূর্ণনকাল পৃথিবীর প্রায় সমান (সাড়ে চব্বিশ ঘন্টা), কিন্তু ভিতরের দিকের উপগ্রহটি মঙ্গলের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় মাত্র ৭ ঘন্টা ৩৯ মিনিট। এর অর্থ-এই উপগ্রহে 'মাস' এর চেয়ে 'দিন' বড়।

উপগ্রহ দু'টির চমৎকার নাম দেয়া হয়। প্রথমে আবিষ্কৃত ও বাইরের উপগ্রহটির নাম দেয়া হয় 'ডিমোস' (ভয়ঙ্কর বা দ্রুতগতি), আর অন্যটির নাম 'ফোবোস' (আতঙ্ক বা ভয়)। এই দুজনেই ছিল অলিম্পিয়ান যুদ্ধ দেবতার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

উপগ্রহের ব্যাস

এটা এখন বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না যে কেন এই উপগ্রহ দু'টি এতদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েনি। আমাদের জানা মতে এরা সৌরজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বস্তু (অবশ্য গ্রহাণু ও উল্কাগুলো ছাড়া) এবং সত্যিকার অর্থে বস্তু দু'টিকে উপগ্রহ পর্যায়ে ফেলাও বেশ শক্ত ব্যাপার। ডিমোসের ব্যাস সম্ভবতঃ ৬ মাইল আর ফোবোসের ব্যাস ১২ মাইলের বেশি হবে না। তবে প্রাথমিকভাবে নির্ণীত এই হিসাব খুব একটা সূক্ষ্ম ছিল না। তবে আবিষ্কারের প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের ভুল হয় এক্ষেত্রে তা ঘটেনি, কারণ এই আকার ছিল সত্যের অনেকটা কাছাকাছি। তাছাড়া মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব কাছাকাছি ছিল, তখনও উপগ্রহ দু'টি তাদের সর্বোচ্চ কৌণিক দূরত্বে থাকা অবস্থায় মঙ্গলের প্রান্ত থেকে মাত্র ২০ থেকে ৬৫ আর্ক সেকেন্ড দূরে ছিল। এই দূরত্ব মাপার জন্য যথেষ্ট বড় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হত। বিজ্ঞানী প্যাট্রিক মুর তার সাড়ে ১২ ইঞ্চি প্রতিফলকে কোন রকমে একবার দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এরা এতই অস্পষ্ট ছিল যে তিনি কখনোই দ্বিতীয়বার একই

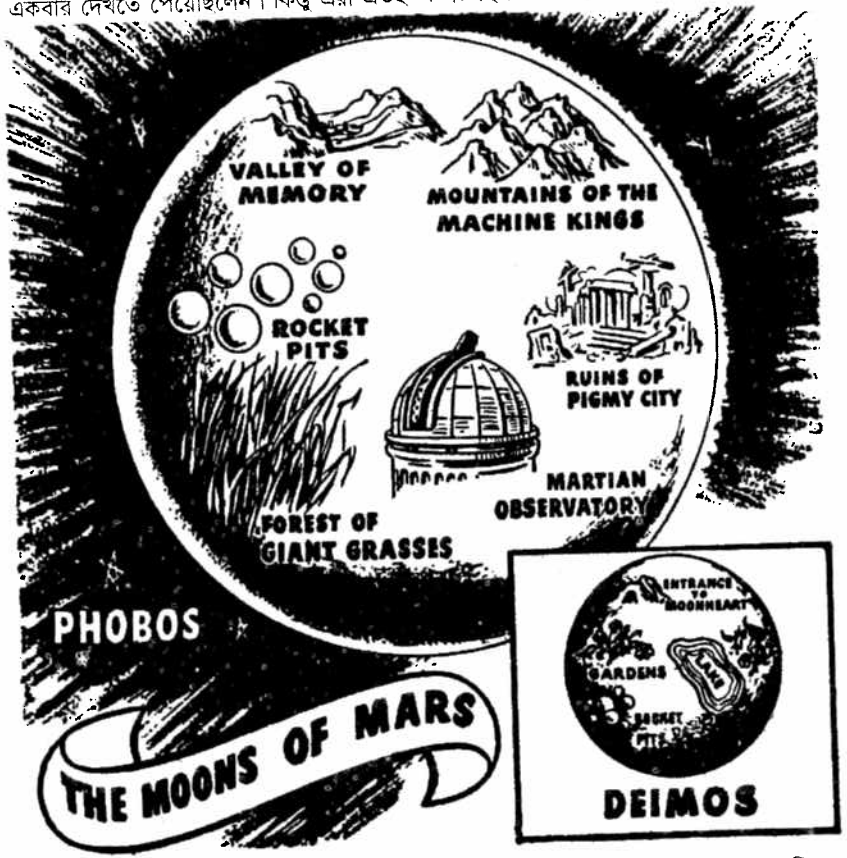

ফোবোস ও ডিমোসের প্রথম মানচিত্র ঃ ১৯৪২ সালে আঁকা উপগ্রহ দু'টির প্রথম মানচিত্র। Captain Future নামে এক ম্যাগাজিনে এই দুই ক্ষুদ্র ও রহস্যময় জগতের মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়। তবে এদের সর্বপ্রথম ও পরিষ্কার ছবি তোলা হয় ১৯৭০ সালে গ্রহ দু'টি আবিষ্কারের প্রায় একশ বছর পর।

পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হননি। তবে সাড়ে ১৫ ইঞ্চি প্রতিফলকে এদেরকে দেখা সম্ভব, যদিও পর্যবেক্ষণের জন্য এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। ১৯৫৪ সালে উইলকিনস যখন মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর ৬০ ইঞ্চি প্রতিফলকের সাহায্যে ডিমোসকে খুব ভাল অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেন তখনও একে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবেই এর পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার চেষ্টা তখন অর্থহীন। এন্টিনোয়াডি তার পর্যবেক্ষণ ফলাফলে বলেছিলেন, ফোবোসকে সাদা আর ডিমোসকে নীলচে দেখায়-যদিও রংয়ের কোন পর্যবেক্ষণ আর কেউ প্রকাশ করেনি। তবে এন্টিনোয়াডির ফলাফলও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন প্রতিসরণ টেলিস্কোপের সাহায্যে, যেখানে বর্ণাপেরণের জন্য অনেক নকল রং দেখা যায়।

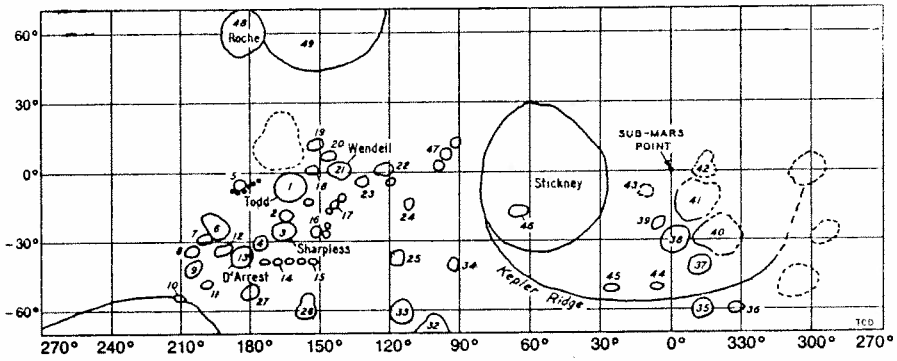

থমাস জেক্সবারির মানচিত্র ঃ মেরিনার-৯ মহাকাশযানের তোলা ছবির উপর ভিত্তি করে জেক্সবারি প্রথম নিখুঁত মানচিত্র আঁকেন। সরল আয়তাকার প্রোজেকশান নেয়ায় ফোবোসের উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের অধিকাংশ খাদই বিকৃত হয়ে পড়ে। জেক্সবারি লক্ষ্য করেন যে ফোবোসের মানচিত্রে রোচে নামে বেশ কয়েকটি খাদ রয়েছে।

উপগ্রহের আকার

এমনকি তখনকার বিজ্ঞানীদের পক্ষে উপগ্রহ দুটি গোলাকার কিনা তাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। হয়ত এরা অনিয়মিত আকৃতির কোন বস্তু এবং দেখতে অনেকটা 'পাথরের টুকরার' মত তবে এদের গঠন সম্পর্কে তারা তখনও ছিলেন পুরোপুরি অজ্ঞ। আর বায়ুমন্ডল থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ এই উপগ্রহ দুটির মুক্তিবেগ খুবই কম- ফোবোসের ৩০ মাইল/ঘন্টা আর ডিমোসের ১৫ মাইল/ঘন্টা। যদিও এটা সত্যি নয় তবু অনেকের মতে এদের যে কোন একটির উপর দাঁড়ানো কোন মানুষ যদি আকাশের দিকে লাফ দেয় তবে ইহজগতে (অর্থাৎ উপগ্রহে) আর ফিরে আসতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে মোটামুটি ওজনের কোন মানুষ দ্বারা কখনই ২ মাইলের চেয়ে বেশি ব্যাসের কোন বস্তুতে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে না। (তবে এই বস্তুর ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের সমান হতে হবে।) অবশ্য একেবারে চলে না গেলেও ফোবোস বা ডিমোস-এ তাকে বেশ আস্তে আস্তে ফিরে আসতে হবে।

ফোবোস

সৌরজগতের সবচেয়ে অদ্ভুতদর্শন উপগ্রহ সম্ভবতঃ ফোবোস। মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৫৮০০ মাইল অর্থাৎ মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে এর দূরত্ব ৩৭০০ মাইলের বেশি হবে না- যা ঢাকা থেকে মিশরের রাজধানী কায়রোর দূরত্বের সমান। খুব কাছে থাকা বস্তুকে ঢাকা থেকে দেখা গেলেও ঢাকা থেকে উত্তরের কোন শহর থেকে একে দেখা যাবে না। একইভাবে মঙ্গলের

উচ্চ অক্ষাংশে দাঁড়ানো কোন মানুষ ফোবোসকে দেখতে পাবে না, কারণ ৬৯° উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশের উপরে উপগ্রহটিকে কখনই দেখা যাবে না। অর্থাৎ মঙ্গলের উচ্চ অক্ষাংশের অধিবাসীরা একটি আর নিম্ন অক্ষাংশের অধিবাসীরা দুটো চাঁদ দেখতে পাবে। আর যারা এই উপগ্রহটিকে দেখতে পাবে তারা এর আকার দেখবে আমাদের চাঁদের এক-তৃতীয়াংশের সমান। তবে বর্তমানে এই আকার এক-পঞ্চমাংশে দাঁড়িয়েছে (ব্যাসের আরও সূক্ষ্ম হিসাবের পর)।

মঙ্গলের চারদিকে উপগ্রহটির দ্রুত আবর্তন আর একটি অদ্ভুত ঘটনার জন্ম দেয়। এটি মঙ্গলের পশ্চিম আকাশে উদিত হয় আর পূর্বাকাশে অস্ত যায়-যা অনেকটা আমাদের পৃথিবীর আকাশে দেখা কৃত্রিম উপগ্রহের মত। এই চাঁদ মঙ্গলের আকাশকে মাত্র সাড়ে চার ঘন্টায় অতিক্রম করে। অর্থাৎ এটি এই পুরো চক্রের অর্ধেক অংশ অতিক্রম করার সাথে সাথে নতুন চাঁদ থেকে পুরোপুরি পূর্ণ চাঁদে রূপান্তরিত হয়। এই ঘটনায় এটি সময় নেয় মাত্র ১১ ঘন্টা ৬ মিনিট। তবে নিম্ন অক্ষাংশের চেয়ে উচ্চ অক্ষাংশে একে অনেকটা বড় দেখা যাবে। প্রায়ই উপগ্রহটি মঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাবে (যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় 'গ্রহণ' বলা হয়ে থাকে)। কেবলমাত্র পুরো আকাশ পরিভ্রমণে গ্রীষ্ম ও শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে এটি গ্রহণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। আর পূর্ণিমার সময় এর জ্যোৎস্না ডিম লাইটের আলোর চেয়েও অস্পষ্ট হয়।

ডিমোস

মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে ডিমোসের দূরত্ব ১২,৫০০ মাইল-যা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ থেকে নিউইয়র্কের দূরত্বের সমান। মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসতে এটি সময় নেয় মাত্র ৩০ ঘন্টা। ফোবোসের মত এটিরও কক্ষপথ প্রায় গোলাকার এবং মঙ্গলের সমতলেই অবস্থিত। মঙ্গলের ঘূর্ণনের সাথে ডিমোসও এর আবর্তন গতি বজায় রেখে চলে, যার ফলে দিগন্তের উপরে একে একটানা প্রায় ৬০ ঘন্টা দেখা যায়, আর এই সময়-এর আবর্তনকালের দ্বিগুণ। ফোবোসের মত একেও মেরু অঞ্চল থেকে দেখা যায় না (৮২° উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশ)। ডিমোসেও একই গ্রহণ ঘটতে দেখা যায়, তবে ফোবোসের মত অতটা ঘন ঘন নয়। পৃথিবী থেকে শুক্রকে যেমন দেখা যায়-মঙ্গল থেকে ডিমোসকে তার চেয়ে কিছুটা বড় ও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কিন্তু পরিষ্কার ছোট চাকতির মত দেখা যাবে।

উপগ্রহ দু'টির মানচিত্র

গোলাকার পৃথিবীর মানচিত্রকে চারকোণা কাগজে রূপান্তরিত করতে একসময় ভূ-বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হলেও মঙ্গলের অনিয়মিত আকারের উপগ্রহ আবিষ্কারের পর এদের মানচিত্র তৈরীর কাজটি আরও জটিল হয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন গ্রহাণু, ধূমকেতু, যাদের সবার আকারই অনিয়মিত, এদের মানচিত্র আঁকার জন্য ভূবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন কিভাবে এসব বস্তুর মানচিত্র চারকোণা কাগজে আঁকা যায়। ১৯৮৮ সালে রাশিয়ার বিশেষ মহাকাশযান 'ফোবোস-২' এই উপগ্রহের নিখুঁত ছবি তুলে পাঠানোর পর এই মানচিত্র তৈরী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তবে ফোবোস ও ডিমোসের প্রথম ছবিটি তোলে মেরিনার-৯ নামে মহাকাশযানটি। এতে দেখা যায় উপগ্রহ দু'টি অসংখ্য খাদে ভর্তি। আর ফোবোসের দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ কিঃমিঃ। মেরিনারের তোলা ৩২টি ছবি থেকে জেক্সবারি সর্বপ্রথম ফোবোসের আকার সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করেন এবং লক্ষ্য করেন-এটি পৃথিবীর চাঁদের মত মূল গ্রহের দিকে সবসময় একটি মুখই দেখায়। তিনি উপগ্রহ দু'টির মানচিত্রও প্রথমবারের মত তৈরী করেন, যাতে মঙ্গলের অবমঙ্গল বিন্দুটিকে এই মানচিত্রের মূলবিন্দু হিসাবে ধরে নেন।

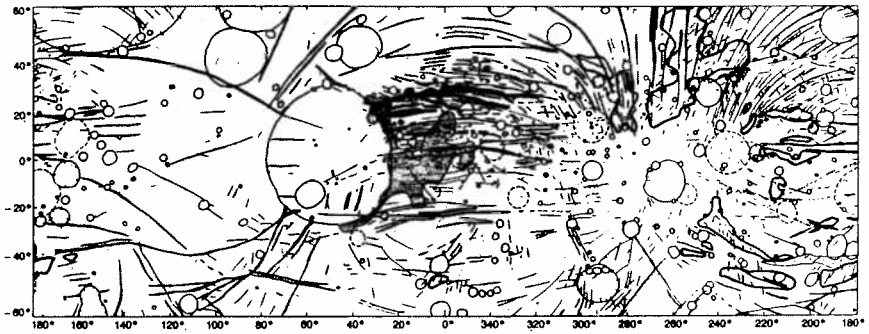

ভাইকিং-এর তোলা মানচিত্র ঃ উচ্চ বিভাজন সম্পন্ন ভাইংকিদ্বয়ের তোলা ছবিকে উপরের মানচিত্রে রূপান্তরিত করেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার থমাস, এই মানচিত্রে মাঝখানের বিশাল খাদ স্টিকনি থেকে বেশ কয়েকটি রেখা বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

মেরিনার-৯ ফোবোসের প্রায় ৭০ শতাংশের ছবি তোলে। এই ছবিগুলোর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল প্রায় ১ কিঃ মিঃ। এই ছবির উপর ভিত্তি করে ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের রালফ টার্নার ফোবোসের একটি গ্লোব তৈরী করেন। পৃষ্ঠের উচ্চতা নিরূপণ করে তিনি ফোবোসের দুই গোলার্ধের মানচিত্র তৈরি করেন। তবে তার তৈরী মানচিত্রটি কিছুটা লম্বাটে উপবৃত্তের মত হয়ে পড়ে।

১৯৭৬ সালে পরপর দুটি ভাইকিং অভিযানের ফলে উপগ্রহটি সম্পর্কে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে। জেক্সবারির মানচিত্র তৈরীর কৌশলকে (প্রোজেকশন নয়, প্লটিং পদ্ধতি) কাজে লাগিয়ে তিনি ফোবোসের আরও নিখুঁত ও বিশ্লেষিত মানচিত্র তৈরী করেন।

অবশেষে টার্নারের গ্লোব আর ফোবোসের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য মানচিত্র তৈরী করেন কানাডার ওয়েস্টার্ন ওন্টেরিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ স্ট্রোক। তিনি গোলার্ধের কেন্দ্রে নিরক্ষীয় অঞ্চলের পরিবর্তে (যা টার্নার করেছিলেন) মেরু অঞ্চলকে স্থাপন করে একটি মানচিত্র তৈরী করেন। তিনি ডিমোসের মানচিত্রও একইভাবে তৈরী করেন। তিনি উপবৃত্তের পরিবর্তে ডিমোসের প্রকৃত আকার অনুসারে এর মানচিত্র তৈরী করেন। উপগ্রহের তোলা ছবি থেকে তিনি তার চিত্রটি পরবর্তীকালে আরও সূক্ষ্মভাবে আঁকেন। নতুন এই চিত্রটি তার প্রজেকশন সম্পর্কিত নতুন গাণিতিক সূত্রের ভিত্তি।

ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জনের সময় তিনি তার গাণিতিক সংজ্ঞাকে আরও পরিশোধিত করার চেষ্টা চালান। তিনি প্রস্তাব দেন যে, এসব বস্তুর বিভিন্ন গোলার্ধের মানচিত্র আঁকতে হলে এদের প্রস্থচ্ছেদের ছবি তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ একটি আলুকে কেটে টেবিলের উপর রেখে উপর থেকে দেখতে যে রকম দেখা যাবে। এই সরল নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি বৃহস্পতির উপগ্রহ এমেলথিয়া এবং শনির উপগ্রহ ইপিমেথিয়াসের মানচিত্রও তৈরী করেন।

'ফোবোস-২' এর সন্ধানীযানের তোলা ছবি থেকে এদের আরও নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করা হয়। জেক্সবারি এদের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন এবং অন্ততঃ একশ'টি নিয়ন্ত্রক বিন্দু থেকে এর ব্যাস মাপার চেষ্টা চালান। টার্নার জেক্সবারির এই মানচিত্র থেকে একটি উন্নত গ্লোব তৈরী করেন, যার ফলে পরিশেষে আরও নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়।

টার্নারের চিত্রের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ কেন্দ্রের রেমন্ড বেটসন ও খাথলেন এডওয়ার্ড এদের একটি ইলেকট্রনিক ভার্সন তৈরী করেন। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা উঁচু-নিচু অঞ্চল ও উজ্জ্বলতার পার্থক্য থেকে ফোবোস পৃষ্ঠের চিত্রটি পরিশোধিত আকারে তৈরী করেন। তারা তাদের তৈরী কৃত্রিম ছবির সাথে প্রকৃত ছবি তুলনা করার পর ফোবোসের ব্যাস কিছুটা পরিবর্তিত করেন। সবগুলো চিত্রের কপি করার পর তারা এদের পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করেন। পরবর্তীকালে শেরমেন ইউ দ্বৈত স্টেরিও বিম্ব নীতির উপর ভিত্তি করে ফোবোসের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তুলে ধরেন।

এই তিন নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ পদ্ধতি গড়ে তোলা হয় যাতে যে কোন অনিয়মিত আকারের বস্তুর মানচিত্র সহজে আঁকা সম্ভব হয়। বেটসন ও এডওয়ার্ডের মানচিত্রে কিছুটা অসঙ্গতি রয়ে গেলেও এটিকেই ফোবোস-এর সবচেয়ে নিখুঁত ছবি বলে মনে করা হয়। তাদের এই চেষ্টার ফলেই আজকে যে কোন অনিয়মিত আকারের বস্তুর ছবি সহজে আঁকা সম্ভব হচ্ছে।

উপগ্রহের গ্রহণ

দুই চাঁদেই সব ধরনের গ্রহণ ও সমাবরণ ঘটে। এরা প্রায়ই মঙ্গলের ছায়ার উপর দিয়ে এপাশ ওপাশ চলাচল করে আর মঙ্গলের অধিবাসীরা(!) একে সূর্যের সামনে দিয়ে প্রায়ই অতিক্রম করতে দেখবে। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসে পড়লে আমরা সূর্যগ্রহণ হতে দেখি। আর পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য পুরোপুরিই ঢাকা পড়ে যায়, যার ফলে সৌর বায়ুমন্ডলের অনেকটাই আমাদের চোখে পড়ে। মঙ্গল পৃষ্ঠ হতে দেখা এ ধরনের গ্রহণে ফোবোস বা ডিমোস সূর্যকে কখনোই পুরোপুরি ঢাকতে পারে না। ফোবোসের পিছনে সূর্যের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ঢাকা পড়ে আর সূর্যকে অতিক্রম করতে এটি সময় নেয় ১৯ সেকেন্ড। এ ধরনের ঘটনা মঙ্গলের এক বছরে প্রায় ১৩০০ বার ঘটে থাকে! অন্যদিকে এ ঘটনা ডিবোসের ক্ষেত্রে ঘটে ১২০ বার, সূর্যের চাকতিটিকে অতিক্রম করতে সময় নেয় ২ মিনিট আর ডিমোসের পিছনে সূর্যের নয় ভাগের এক ভাগ ঢাকা পড়ে। এর অর্থ, মঙ্গলের অধিবাসীরা সূর্যের চারপাশে এর করোনা বা অভিক্ষিপ্তাবস্থা দেখতে পাবে না।

মঙ্গলে জোয়ার-ভাটা

পৃথিবীতে চাঁদের প্রভাবে পূর্ণিমা ছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা ঘটে সেটি হচ্ছে। জোয়ার-ভাটা। পূর্ণিমার সময় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর সমুদ্রের বুকে ঘটে জোয়ার-ভাটার মত অপূর্ব এক দৃশ্য। পৃথিবীর সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের নাবিকদের কাছে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলে মহাকাশযান পাথফাইন্ডার ও রোবটযান 'সোজার্নার'-এর সফল অভিযান থেকে আমরা জানি মঙ্গলে এক সময় পানির অস্তিত্ব ছিল। যদিও এখন মঙ্গলে কোন পানির অস্তিত্ব নেই, তবু একথা পরিষ্কার যে-পানি বা সমুদ্র থাকলেও ফোবোস বা ডিমোস, কেউই মঙ্গলের সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ঘটনা ঘটাতে সক্ষম নয়। আমাদের তুলনায় মঙ্গলের সমুদ্র (যদি পানির অস্তিত্ব থাকত) অনেক স্থির ও মন্থর হত। বিশেষ করে, বায়ুমন্ডলের হালকা বায়ু ও দুর্বল সূর্যাকর্ষণ সমুদ্রে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না।

উপগ্রহগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরবর্তী গবেষণার ফলাফল থেকে উপগ্রহগুলো সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। ডিমোসের আবর্তনকাল ৩০.৩ ঘন্টা আর ফোবোসের আবর্তনকাল ৭.৭ ঘন্টা–অর্থাৎ ডিমোস আমাদের চাঁদের মত পূর্বদিকে উদিত হলে ফোবোস উদিত হয়

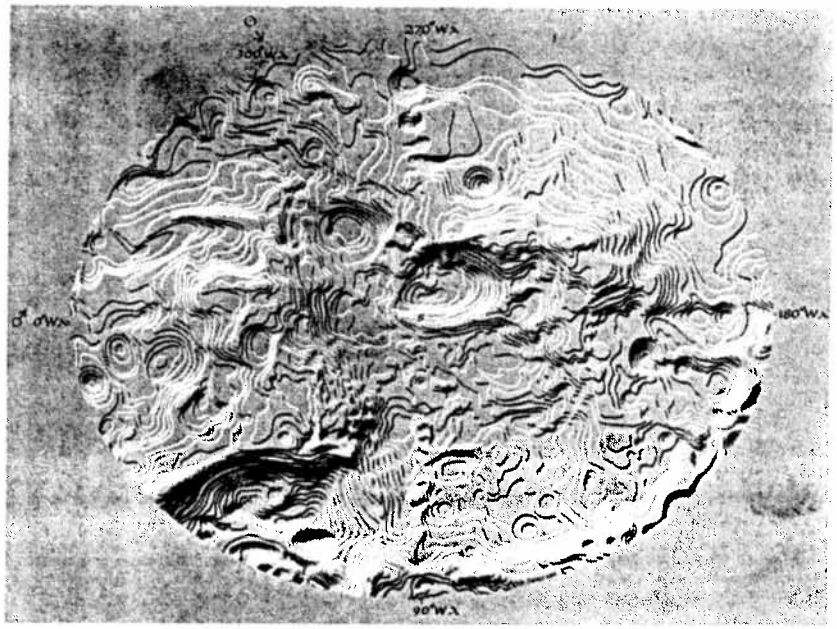

ফোবোসের দক্ষিণ অঞ্চলের চিত্র ঃ র‍্যালফ টার্ন-এর তেরী ফোবোসের দক্ষিণাঞ্চলের চিত্রটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ছবির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। ছবিতে যে কোন দুই রেখার উচ্চতার পার্থক্য ১০০ মিঃ। মাঝখানে বিশাল খাদ 'হল'কে দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমদিকে। চাঁদের মত মঙ্গলের উপগ্রহগুলোও সবসময় মঙ্গলের দিকে একই মুখ করে থাকে। কারণ এদের আবর্তন ও মঙ্গলের চারদিকে প্রদক্ষিণের সময় একই।

মহাকাশ অভিযানলব্ধ ফলাফল হতে জানা যায় যে, ফোবোস ও ডিমোসের আকার প্রায় একই–তিন অক্ষের উপবৃত্ত। ফোবোসের প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭, ২১ এবং ১৯ কি. মি.; অন্যদিকে ডিমোসের ১৫, ১২ এবং ১১ কি. মি.। মহাকাশযানগুলোর তোলা ছবি থেকে দেখা যায় ফোবোস ও ডিমোসের পৃষ্ঠ অসংখ্য খাদে পূর্ণ। এসব খাদের আকার ও সংখ্যা হতে বোঝা যায়, এই উপগ্রহগুলো অনেক পুরানো। তবে এদের পৃষ্ঠ পুরোপুরি একরকম নয়। ফোবোসে খাদের সংখ্যা বেশি হলেও পাথুরে খন্ড খুব একটা বেশি নেই। ডিমোসের পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত মসৃণ, কারণ এর পৃষ্ঠে রয়েছে ধূলোবালির পুরো একটি স্তর, তবে ডিমোসের পৃষ্ঠের কোথাও কোথাও আমাদের ঘরবাড়ির সমান বড় বড় পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়।

উপগ্রহগুলোর পৃষ্ঠ বেশ অন্ধকার। ডিমোস ও ফোবোসের প্রতিফলন ক্ষমতা যথাক্রমে ০.০২২ এবং ০.০১৮। চাঁদের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত কম আলো প্রতিফলন করে (চাঁদের প্রতিফলন ক্ষমতা ০.০০৭) এবং আমাদের জানা সৌরজগতের সবচেয়ে কৃষ্ণকায় বস্তু। পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতা দেখে বোঝা যায় এই উপগ্রহগুলো এক ধরনের উল্কাবস্তু, যাদের কার্বনেসিয়াস কেনড্রাইটস বলা হয়, এবং কৃষ্ণকায় গ্রহাণু 'সেরেসের' গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপগ্রহগুলোর উৎপত্তি রহস্য

উপগ্রহগুলোর ক্ষুদ্র আকার আর মঙ্গল গ্রহ থেকে এদের দূরত্ব অস্বাভাবিক কম হওয়ায়

এদের উৎপত্তি সম্পর্কে এক সময় বহু মজার মজার মন্তব্য করা হয়েছিল। তখনকার বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, যখন মঙ্গল গ্রহ অভিযান শুরু হবে তখন এই ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলোকে পেট্রোল পাম্প বা জ্বালানি পূর্ণ করার স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ না থাকলেও ষাটের দশকে উপগ্রহগুলো সম্পর্কে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক অপ্রত্যাশিত ও কৌতুহলোদ্দীপক মন্তব্য করে বসেন। রাশিয়ার জ্যোর্তিবিজ্ঞানী স্কালোভস্কি বিশ্বাস করতেন যে, মঙ্গলে উন্নত প্রাণী আছে এবং উপগ্রহ দু'টি তাদের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ।

১৯৪৫ সালে সার্পলেস ও ১৯৫৪ সালে জে. ও এল. উইলপল এর হিসাবে দেখা যায়, ফোবোস ক্রমশ কুন্ডল গতিতে মঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে এবং কক্ষপথে এর আবর্তন গতিও বাড়ছে। অন্যদিকে ডিমোস সম্ভবতঃ মূল গ্রহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আশা করা যায় আজ থেকে প্রায় ৩৫,০০০,০০০ থেকে ৪০,০০০,০০০ বছরের মাঝে এটি মঙ্গলে আঘাত করবে এবং সেই সাথে জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এটি এখনও রোচে সীমানা (গ্রহের আকর্ষণীয় সীমা)-এর বাইরে রয়েছে তবে খুব একটা দূরে নয়। রোচে সীমানা অতিক্রম করার সাথে সাথে ভেঙ্গে যাবে না টিকে থাকবে তা নির্ভর করে এর অভ্যন্তরীন গঠনের উপর।

যদি এই হিসাব সত্যিও হয় তবুও মঙ্গলের দিকে ফোবোসের এগিয়ে যাওয়ার গতি এখনও বেশ মন্থর। স্কালোভস্কির বিশ্বাসের পিছনে কারণ সম্ভবত ছিল এই যে, মঙ্গলের বাইরের স্তরের অনুভূত বায়ু ফোবোসের গতি কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। যদি এটি সাধারণ কোন বস্তু হত তবুও তার উপর এর কোন প্রভাব থাকত না। কিন্তু গ্রহের হালকা বায়ুস্তরও একেবারে স্বল্প ভরসম্পন্ন বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। এর আপাত: উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় এর ব্যাস ১০ থেকে ১২ মাইলের বেশি হবে না এবং এটি সম্ভবত ফাঁকা। তাই স্কালোভস্কির বিশ্বাস এরা কৃত্রিমভাবে তৈরী কোন বস্তু। ১৮৭৭ সালের পূর্বে উইলিয়াম হার্সেল ও ডি'অ্যারেস্ট-এর মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই উপগ্রহ দু'টিকে খুঁজে না পাওয়ার কারণ সম্ভবত: তখন তাদের অস্তিত্বই ছিল না, কারণ তখনও তারা উৎক্ষিপ্তই হয়নি!

যদি বলা হয় যে, স্কালোভস্কি ছিলেন একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী যার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তারার গঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে, তবুও মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস ও ডিমোস সম্পর্কে তার মন্তব্য খুব একটা গুরুত্বের সাথে ধরা হয়নি। যদিও ধরে নেয়া যায় যে, ফোবোস মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারপরও এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য সত্য বলে ধরে নেয়াটা হাস্যকর হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হলেও এটা সত্যি মঙ্গলে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানগুলো প্রমাণ করবে যে, উপগ্রহগুলোও ধাতুর তৈরী নয় বরং এরা অন্যান্য উপগ্রহের মত স্বাভাবিক চাঁদ মাত্র।

পরে এই সমস্যাটি বিজ্ঞানী স্কিলিং পুনরায় হিসেব কষে বের করেন। তিনি অনুমান করেন যে, মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের প্রভাবে ফোবোস পাথুরে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে জে. জপিক, যিনি স্কালোভস্কির ধারণাকে উড়িয়ে দেননি, প্রস্তাব দেন যে, উপগ্রহ দু'টির এ রকম অদ্ভুত আচরণের কারণ ফোবোসের প্রতি মঙ্গলের কঠিন পৃষ্ঠের অস্থিতিস্থাপক মাধ্যাকর্ষন'।

বর্তমানকালের বিজ্ঞানীদের ধারণা, মঙ্গল ও তার উপগ্রহ গ্রহাণু বেল্টের কাছাকাছি অবস্থিত। সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোর উপগ্রহেও এই বেল্টের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফোবোস ও ডিমোসকে কখনই স্বাভাবিক উপগ্রহ বলে মনে করা হয়নি। মঙ্গল উৎপত্তির সময় এরই দেহের একটি-দু'টি অংশ ছুটে গিয়ে এই উপগ্রহ উৎপন্ন হয়েছে। মঙ্গলের উপগ্রহগুলো দেখতে অনেকটা অনিয়মিত আকারের গ্রহাণুর মত। যদি ধরে নেয়া যায় এই উপগ্রহগুলো গ্রহাণু বেল্টে উৎপন্ন হয়েছে, তবে এও ধরে নিতে হয় পরবর্তীকালে এরা মঙ্গলের

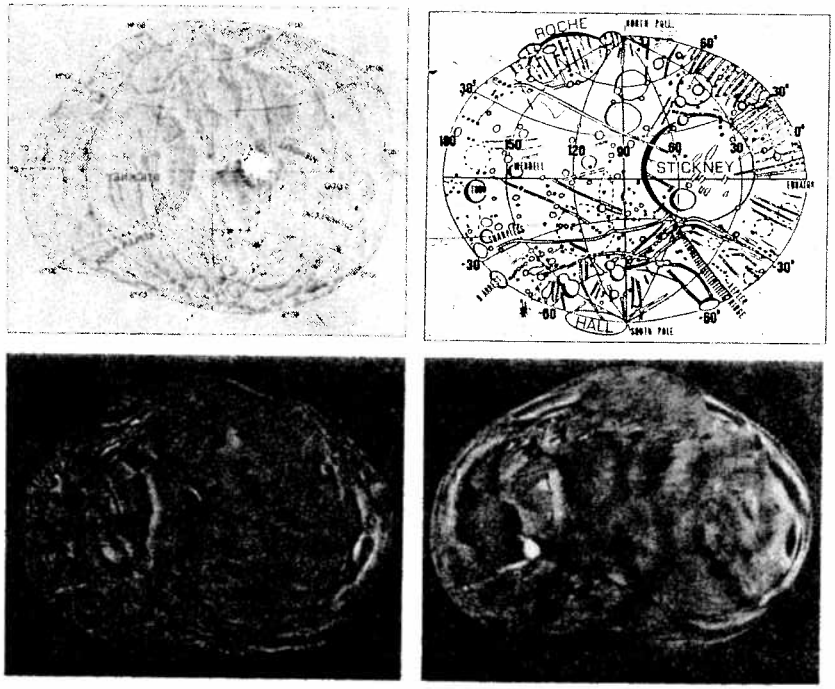

ফিলিপ স্টোকোর তৈরী ফোবোসের সর্বশেষ ও আধুনিক চিত্র ঃ উপগ্রহটির অনিয়মিত আকার উপরের চিত্রে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে (বাঁয়ে)। প্রথমটির মানচিত্রটি (উন্নত মানচিত্রটি) ডানদিকে দেখানো হয়েছে। ভাইকিং-এর তোলা ছবির পরিশোধিত চিত্র নিচে। এই ছবিগুলো থেকে দেখা যায় ফোবোসে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট খাদ রয়েছে।

মাধ্যাকর্ষণের মায়াজালে আটকা পড়ে যায়। তবে এখন পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যায়নি। আর পাথফাইন্ডার অভিযানের সময় রোবটযান 'সোজার্নার' উপরে চোখ তুলে আকাশ দেখার সুযোগ পায়নি। তবে গত ডিসেম্বরে মঙ্গল গ্রহে যেয়ে পৌঁছেছে 'মার্স সার্ভেয়ার' যার গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এই বিতর্কিত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমাদের চাঁদের সাথে মঙ্গলের এই বামনাকৃতি চাঁদের প্রায় কোনরকম মিল নেই বললেই চলে। অনেকটা আলুর মত দেখতে উপগ্রহগুলোর সাথে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝামাঝি অবস্থিত গ্রহাণু বেল্টের গ্রহাণুগুলোর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ গ্রহাণু সেরেসের দিকে তাকালে এদেরকে সেরেসের সমগোত্রীয় বলেই মনে হয়। তবে উপগ্রহ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকভাবে উপকৃত হয়েছেন। কারণ এদের আবর্তনকাল ও প্রদক্ষিণ করার আচরণ থেকে মঙ্গলের ভর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তবে টেলিস্কোপ পর্যবেক্ষণের চেয়ে মহাকাশগুলোর খুব কাছে থেকে দেখা পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি কার্যকর হবে। তবে ভবিষ্যৎ মঙ্গল অভিযানে এই উপগ্রহ দুটো যে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্র ঃ 1.Guide to mars - by Patrick Moore, London.
2. Sky & telescope - May 1989
3. Astronomy- The Cosmic perspective-Zeilik & Gaustad, 2nd Edition.
4. বিশ্ব ও সৌরজগৎ- মোঃ আব্দুল জব্বার